সূচিপত্র

লেখকের কথা 4

ভূমিকা 6

প্রথম অধ্যায় 9
আসুন একটু ভাবি… 9
অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন 11
রূপসাগর 13

দ্বিতীয় অধ্যায় 17
ব্যবসা কাঠামো 21

তৃতীয় অধ্যায় 25
টাকা কী 27
ক্রমবর্ধমান মুদ্রা ও চক্রবৃদ্ধি সুদ 30
অর্থনীতি 41

চতুর্থ অধ্যায় 45
ব্যবসা কাঠামোর গভীর বিশ্লেষণ 45
মূল্যস্ফীতির কারণ 51
যত উৎপাদন তত কেন মূল্যস্ফীতি 53

- প্রশ্নোত্তর পর্ব 55
- পঞ্চম অধ্যায় 58
- ব্যাংকব্যবস্থা এবং দেউলিয়াত্ব 58
- ভেলার ভেলকি 61
- ঋণের চাকা 62
- সুদরুপী এ্যানাকোন্ডা 62
- জম্বি কোম্পানী 66
- আরও গভীরে দেখুন 69
- শেষ পরিণতি 75
  - ১ মুদ্রা যখন প্রাকৃতিক 77
  - ২ মুদ্রা যখন সরকারি 77
  - ৩ মুদ্রা যখন ব্যাংকের হাতে 78
- ষষ্ঠ অধ্যায় 78
- অদৃশ্য মুদ্রা 78
- হাওয়াই টাকা 79
- জাদুর হালখাতা 86
- ব্যাংক-টাকার অর্থনৈতিক মেকানিজম 90
- সমাজ ব্যবস্থা 92
- সরকার 94
- অর্থনৈতিক মন্দা ও বেইল আউট 95
- বিভিন্ন প্রকার অর্থ ব্যবস্থা 98

সপ্তম অধ্যায় 100

চেকের প্রবর্তন 100

ডিপোজিট ব্যাংকিং 105

মুক্ত বাজার অর্থনীতি 109

অষ্টম অধ্যায় 113

টাকার গোপন রহস্য 113

আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার চমক 115

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নোট 122

সোনা-রুপার মুদ্রা ছেড়ে কাগজী মুদ্রা 123

সূক্ষ্ম কৌশলে চুরি 125

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা 126

বাণিজ্যিক ব্যাংক ও মুদ্রাব্যবস্থা 127

তারল্য সংকট (Liquidity Crisis) 131

পুঁজি ঘাটতি (Capital Shortfall) 132

মনেটারি পলিসি 133

ফিসকাল পলিসি 140

শেষ কথা 142

শব্দকোষ ও প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা 146

লেখকের কথা

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে William T. Still এর প্রামাণ্যচিত্র “The Money Masters” দেখার সময় নিচের উক্তিটি আমার চোখে পড়ে।

“It is well enough that people of the nation do not understand our banking and monetary system, for if they did, I believe there would be a revolution before tomorrow morning.”

“এটা স্বস্তিকর যে, দেশের জনগন ব্যাংকিং এবং মুদ্রা ব্যবস্থার রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা যদি বিষয়গুলো জানতো, আগামীকাল রাত পোহাবার আগেই গণবিপ্লব শুরু হয়ে যেতো। ”

হেনরি ফোর্ড (ফোর্ড মোটর কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা)

হেনরি ফোর্ডের এই বক্তব্যের মর্ম জানার জন্য তখন থেকেই আমার মন খচখচ করতে থাকে। সেই সময় এ সম্পর্কে গভীরভাবে কিছু উপলব্ধি না করলেও এতটুকু নিশ্চিত হতে পেরেছিলাম যে, ব্যাংকিং ও মুদ্রা ব্যবস্থার রহস্যময় কিছু বিষয় অর্থনীতির ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও আমার অধরাই রয়ে গেছে। উচ্চতর অধ্যয়নের পরবর্তী ধাপগুলোতে নিয়তই আশ্চর্যান্বিত হয়েছি এই দেখে যে, মুদ্রা ব্যবস্থার নিগূঢ় বিষয়গুলো কোনো প্রতিষ্ঠানেই পড়ানো হচ্ছে না। "নরওয়ে স্কুল অফ ইকোনমিক্স"-এ মুদ্রা বিষয়ে একটি মাত্র কোর্স ছিলো, যার বিষয়বস্তু ততদিনে আমার ভালোভাবেই দখলে এসে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে, যখন জার্মানির স্বনামধন্য "মানহাইম বিজনেস

স্কুলে" দ্বিতীয় মাস্টার্সের উদ্দেশ্যে যাই, সেখানেও এই বিষয়ে কোন কোর্স পাইনি। অথচ এই দুটি প্রতিষ্ঠানই ছিল সেই দুই দেশের সেরা বিজনেস স্কুল।

মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা আমাদের জন্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনীতি বোঝার অবিচ্ছেদ্য পাঠ এগুলো। কিন্তু তারপরেও কেন জানি মুদ্রা ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার গুপ্ত দিকগুলো সবসময় এড়িয়ে যাওয়া হতো। এমনকি বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা অর্থনীতিবিদ Richard Werner ও এমন মন্তব্য করেছেন। এই বিষয়ে তিনি আরও যোগ করেন যে,

“Economics that is taught at University is not the real Economics. It is a whole second economics of how things really work.”
-Richard Werner, Central Bank watcher and investment strategist, Author and researcher

“ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিখানো অর্থনীতি বাস্তব ভিত্তিক না। বিশ্বব্যবস্থা কীভাবে চলছে তা বুঝতে সম্পূর্ণ নতুন ধারার অর্থনীতির পাঠ প্রয়োজন।”
রিচার্ড ভার্নার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক গবেষক, লেখক এবং বিনিয়োগ কুশলী

এই নতুন ধারাটা কী? তা জানার আগ্রহই আমার জ্ঞান অর্জনের যাত্রার চালিকাশক্তি হয়ে উঠে। তাই আনুষ্ঠানিক পড়াশোনার গন্ডি ভেদ করে আমি ব্যক্তিগত অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকি। এভাবে দীর্ঘ অধ্যবসায় ও ক্রমাগত সাধনার ফলে এক সময়ের ভাসা ভাসা ধারণাগুলো ক্রমশই স্বচ্ছতর হতে থাকে।
বর্তমানে এই জ্ঞানকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন সহ বিভিন্ন

অনলাইন প্লাটফর্মে লেখালেখি করছি। মূলত, পাঠকদের উচ্ছ্বসিত সাড়াপ্রাপ্তির পর বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করে সরল ভাষায় একটি বই লেখার উদ্যোগ নেই।

এই বইটি রচনার ক্ষেত্রে অন্যতম কঠিন একটি কাজ ছিল ভাষার সরলতা বজায় রাখাটা। একই সাথে মৌলিকতা ধরে রাখা এবং গল্পের ছলে বর্ণনা করা খুব একটা সহজ কাজ না। কিন্তু সবার কাছে বাণী পৌঁছে দিতে সেই কঠিন সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত অটল থেকেছি এবং অর্থনীতি বিষয়ে অজ্ঞ পাঠকদেরকে দিয়ে পড়িয়ে, বোধগম্যতা নিশ্চিত করেই পান্ডুলিপিটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেই।

সবশেষে যেই দুই জন ব্যক্তির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলেই নয়, তারা হচ্ছেন মিনহাজ রেজা ভাই এবং মাহমুদ রহমান। বইটির ভাষাগত মাধুর্যতার পিছনে তাদের স্নেহ মাখা হাতের স্পর্শ পরতে পরতে লেগে আছে। আল্লাহ তাদের পরিশ্রম ও ত্যাগকে কবুল করুক।

আশা করি, শত শ্রমের বিনিময়ে রচিত বইটি আলো প্রদানকারী একটি কর্ম হিসেবে যুগ যুগ আমাদের মাঝেটিকে থাকবে। আমিন।

ধন্যবাদান্তে
- মোহাইমিন পাটোয়ারী
অর্থনৈতিক বিশ্লেষক এবং লেখক

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের প্রতি। দুরূদ ও সালাম শেষ নবী রাসুলুল্লাহ সাঃ এর প্রতি।

আপনি হয়তো থ্রিলার পড়তে পছন্দ করেন; আর বাস্তবমুখী থ্রিলার? 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বাস্তব দুনিয়ার লুকায়িত সত্যকে উন্মোচনকারী অবিশ্বাস্য

এক থ্রিলার। এর শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভ্রমণ ব্যতিত আপনার চোখ ও শরীর বিশ্রাম নিতে নারাজ। মুহুর্মুহু উত্তেজনাপূর্ণ যাত্রায় ঘোরা হয়ে যাবে অর্থনীতির অচেনা অলি-গলি। গল্পে গল্পেই ভেদ হবে মায়াবী জালের রহস্যগুলো। উন্মোচিত হবে ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার জন্ম রহস্য, যৌবন কাহিনী এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তার আধুনিক হয়ে উঠার গল্প।

অর্থনীতি জাতীয় বিষয়াদির জটিলতা প্রশ্নাতীত। তদুপরি, এক মলাটেই মূল্যস্ফীতি, ভার্চুয়াল কারেন্সি, দেউলিয়াত্ব, অর্থনৈতিক মন্দা, বেইল আউট, জম্বি কোম্পানি, তারল্য সংকট প্রভৃতি যুক্ত হলে, পুরো বিষয়টাই জগাখিচুড়ি পাকিয়ে মাথার উপর দিয়ে চলে যাওয়ার কথা। কিন্তু, এখানেই লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারীর কারিশমা। মৌলিক পরিভাষাগুলোকে তিনি অত্যন্ত সাবলীল উপস্থাপনায়, গল্পের ছলে সহজপাচ্য করে তুলে ধরেছেন। অর্থনীতির অ আ ক খ ধারণা ব্যতীতই, বইটি আপনার অন্তরের গহীনে তার বার্তাগুলো নিয়ে পৌছে যাবে, নিরন্তর কড়া নাড়তে থাকবে। আপনি ঝাঁপ দিবেন চমকপ্রদ একটা এ্যাডভেঞ্চারে, যার সাথে সিন্দাবাদের ভ্রমণ কিংবা অ্যালান কোয়াটারমেইনের গুপ্তধনের খোঁজে যাওয়ারই তুলনা চলে। সময়, সুযোগ ও সাহসের অভাবে যেই যাত্রাটা আপনি কখনোই শুরু করেননি, “দি লর্ড অফ দা রিংস” এর 'গ্যানডাল্ফ' হয়ে মোহাইমিন পাটোয়ারী আপনাকে ছোঁ করে তুলে নিয়ে সেই সফরেই বেরিয়ে পড়বেন। আর “হবিট”-দের মতো আপনি ছুটে চলবেন 'মিডল আর্থে'; ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য উদ্ধারে। ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ সময়মতো ধেঁয়ে আসবে আপনার হাতের নাগালেই! অর্থনীতি বিষয়ে নিতান্ত অজ্ঞ হলেও যাত্রার অনিঃশেষ রস, সুবাস যেন ফুরোবার নয়।

আরেকটি আলোচ্য দিক হলো, "ব্যাংক ব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য" কোনো ধর্মীয় বই না। এর লেখক মোহাইমিন পাটোয়ারীও কোনো ধর্মীয় বক্তা নন। এই

উজ্জীবিত তরুণ অর্থনীতি বিশ্লেষক, অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকেই সব আলোচনা করেছেন এবং আলোচনার পরতে পরতে তিনি পশ্চিমা দার্শনিক, অর্থনীতিবিদ ও নীতি-নির্ধারকদের এমন কিছু উক্তি সংগ্রহ করেছেন যা পাঠকদের বিস্মিত করতে বাধ্য। যেমন আড়াইশ বছর আগের তৃতীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট থমাস জেফারসনের উক্তিটি,

“আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে বিদেশী সেনাবাহিনীর থেকেও বেশি বিপদজনক হচ্ছে ব্যাংক ব্যবস্থা।”

অথবা ইংরেজ-জার্মান ব্যাংকার ও ফাইন্যান্সিয়ার নাথান মেয়ার রথসচাইল্ডের এই উক্তিটি,

“যেই সুবিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য অস্ত যায় না, তার সিংহাসনে কে বসল আমার তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ যে ব্রিটেনের মুদ্রা সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মূল ক্ষমতার মালিক, আর ব্রিটেনের মুদ্রা ব্যবস্থা আমারই নিয়ন্ত্রণে।”

সবশেষে, এই রোমাঞ্চকর যাত্রার অন্তে আছে রুপকথার গল্পের মতই গুপ্তধন। আর তা হচ্ছে আপনার বহুদিনের সঞ্চিত সব প্রশ্নের উত্তর! টাকা আর ব্যাংকের মাঝে এত মধুর রসায়নটা কী? ধেই ধেই করে উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়া বিশ্বে, হু হু করে সবাই দেউলিয়া হচ্ছে কেন? উন্নয়নের স্বপ্ন দেখিয়ে আপনার আমার সকল সম্পদ কীভাবে হাতিয়ে নেওয়া হচ্ছে! ইত্যাদি। আর হ্যাঁ, গল্প গুলোর ফাঁকে ফাঁকে রাখা যুতসই সব চার্ট এবং রেফারেন্সগুলো আপনাকে গায়ে কাঁটা দেওয়া বাস্তবতার দিকে ঠেলে দিবে।

ব্যবসা, চাকরি, কিংবা কৃষি, যে যেভাবেই উপার্জন করি না কেন, আমরা সবাই আয় -উপার্জনের চিন্তায় বিভোর, এই ব্যাপারে আমরা যার পর নাই সচেতন। অপরদিকে, 'অর্থনীতি' হলো অবহেলার অন্যতম ক্ষেত্র, যেখানে আমরা কোন আগ্রহই খুঁজে পাই না! অথচ, আপনি চাল কিনেন কিংবা চিনি, এর পিছনে আছে অর্থনীতি; যক্ষের ধনের মত টাকা সঞ্চয় করে রাখেন কিংবা ব্যয় করে ফেলেন, এর পিছনেও আছে অর্থনীতি; সোনা-রুপায় লেনদেন করেন কিংবা কাগজ-কার্ডে, এর পিছনেও রয়েছে অর্থনীতি। তারপরেও এই বিষয়ে অজ্ঞতা কাটানোর ন্যূনতম প্রচেষ্টাও চোখে পড়ে না। সেই অজানা জগতের বাস্তবিকতাগুলোই গল্পের মণিমুক্তায় ভরিয়ে অপরূপ করে তুলেছে 'ব্যাংকব্যবস্থা ও টাকার গোপন রহস্য' বইটি।[1] আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বইটি পাঠকদের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ মিনহাজ রেজা
উদ্যোক্তা, অর্থনীতিবিদ ও সম্পাদক

---

[1] “ওহে মানবজাতি! ভূমন্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো হতে বৈধ উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুতঃ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।” - আল কুরআন, সুরা বাক্বারা, আয়াত ১৬৮

প্রথম অধ্যায়

আসুন একটু ভাবি…

আপনি কখনো ভেবে দেখেছেন কি, সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কী? টাকা উৎপন্ন হয় কীভাবে? কাগুজে টাকার মাঝে মূল্যমান প্রবেশ করে কেন? অর্থনৈতিক বৈষম্য বেড়ে যাচ্ছে কেন? এই প্রশ্নগুলো হয়তো আমার মত আপনাকেও তাড়া করে বেড়িয়েছে এবং এগুলোর উত্তর হয়তো বা আংশিক পেয়েছেন কিংবা কোন উত্তরই খুঁজে পান নি। আপনি উপরের যে দলভুক্তই হয়ে থাকুন না কেন, কোন চিন্তা করবেন না, কারণ এই বইয়ে আমরা সবগুলো প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানবো। আর আমাদের এই জানার যাত্রা খুব সাধারন একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করি, “সুদ এবং ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কী?”

প্রথমত, এই প্রশ্নটি সাদা চোখে খুব সরল কিংবা অযৌক্তিক মনে হতে পারে। অথবা মনে হতে পারে, এমন প্রশ্ন করারই বা কী প্রয়োজন ছিল? তবে প্রকৃতপক্ষে প্রশ্নটি মোটেও সরল কিংবা অযৌক্তিক নয়। চিন্তা করে দেখুন- সুদের সাথে ব্যবসার তুলনা করতে গিয়ে প্রথমে যেই পয়েন্টটি উঠে আসে তা হচ্ছে 'সুদে কোন ঝুঁকি নেই'। কিন্তু এই কথাটি সম্পূর্ণ 'সঠিক' নয়। কারণ ঋণদাতা সর্বাত্মক চেষ্টা করেও শতভাগ ঝুঁকিবিহীন পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে না। একজন গ্রাহক ঋণ নেবার পরে দেউলিয়া হতে পারে, অর্থ আত্মসাৎ করে পালিয়ে যেতে পারে কিংবা সম্পদশূন্য অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। এগুলো সবই মহাজনের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ। তাই, 'সুদে কোন ঝুঁকি নেই' কথাটি সম্পূর্ণ সত্য না। সুদে ধার দিলে

ঋণদাতারও ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সুযোগ আছে।

সুদের ব্যাপারে দ্বিতীয় যেই পয়েন্টটি আমাদের সামনে আসে তা হচ্ছে, বস্তুগত পণ্যের (যেমন-ঘর বাড়ির) ক্ষয় (depreciation) আছে। একটি বাড়ি ধীরে ধীরে পুরানো হয়, ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এমনকি একসময় ভেঙ্গে পড়ে যায়। তেমনি করে একটি গাড়ি কিংবা একটি কারখানাও একসময় অচল হয়ে যায়। সেই তুলনায় টাকার কোন ক্ষয় নেই।

কিন্তু খেয়াল করুন, সম্পদের যেমন ক্ষয় আছে, তেমনি টাকারও মূল্যমানের ক্ষয় আছে। এই বছর যেই বস্তুটির মূল্য ১০০ টাকা, ১০ বছর পরে তার মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হয়ে যাবে ২০০ টাকা। এমনকি একসময় হয়তো ১০০ টাকার নোটও অচল হয়ে যাবে। এমনটি হবার কারণ কী? কারণ হচ্ছে, টাকার মূল্যমানের ক্ষয়।

অর্থাৎ, ব্যবসায় ক্ষয় আছে কিন্তু সুদে কোন ক্ষয় নেই, এই কথাটিও ভুল।

সুদ নিয়ে অপর যেই অভিযোগটি উঠে, তা হলো একজন সুদী মহাজন গ্রাহকের থেকে জোরপূর্বক টাকা আদায় করে থাকে। গ্রাহক লাভ করেছে নাকি লোকসান করেছে, তা তিনি বিবেচনা করেন না। সকল পরিস্থিতিতেই কেবল নিজের লাভ বুঝেন।

এই কথা গুলো সত্য, তবে একই বাস্তবতা ব্যবসার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায়। একজন বিপণি বিতানের মালিকও তার দোকান ভাড়া নেওয়া ব্যবসায়ীর অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করেন না। ভাড়াটিয়া ব্যবসায়ীর ব্যবসায় লাভ হোক কি লোকসান, মাস শেষে তিনি এক প্রকার জোরপূর্বক ভাড়া আদায় করে থাকেন। তাই একমাত্র সুদী মহাজন টাকা আদায়ের ব্যপারে কঠোর, কিন্তু ব্যবসায়ী নয়, এই কথাটিও সঠিক নয়।

সুদের সাথে ব্যবসার পার্থক্য আলোচনা করতে গিয়ে চতুর্থ যেই বিষয়টি উঠে আসে তা হচ্ছে, ব্যবসার পরিচর্যা ব্যয় আছে। যেমন- একটি বাড়ি মেরামত করা, রং করা কিংবা অন্য কোন সমস্যা হলে ঠিকঠাক করাই হলো বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়।

অন্যান্য সম্পদের বেলায়ও অনুরূপ দেখাশোনা করতে হয়। যেমন একটি গাড়ি কিনে ভাড়া দিলে গাড়ির মেরামত করতে হয়, একটি বাগান ভাড়া দিলে বাগানের দেখাশুনা করতে হয় ইত্যাদি। কিন্তু টাকার বেলায় এরূপ কোন পরিচর্যা খরচ নেই। এই দাবীটিও 'পুরোপুরি' সঠিক নয়। টাকার সরাসরি পরিচর্যা খরচ না থাকলেও এর নিরাপত্তা প্রদান, কর্মচারিদের বেতন, অফিস ভাড়া, কারেন্ট বিল ইত্যাদি বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়। আবার একজন গ্রাহক দেউলিয়া হয়ে গেলে, সেই ক্ষতির ভারটাও মহাজন বা ব্যাংককেই বহন করতে হয়। এই সব কিছুই সুদভিত্তিক ঋণের পরিচর্যা খরচ।

তাই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ আছে কিন্তু ঋণের বেলায় কোন ব্যয় নেই, তা যুক্তির ধোপেটিকবে না।

সুদের ব্যাপারে আরেকটি আলোচনা রয়েছে যে, সুদে আয় নির্দিষ্ট কিন্তু ব্যবসার আয় অনির্দিষ্ট।

চিন্তা করে দেখুন, আপনি একটি বাড়ি কিংবা দোকান তৈরি করে ভাড়া দিলে, চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন। সুদের মত বাড়ি ভাড়ার রিটার্নেও কোন তারতম্য হয় না। আবার একটি গাড়ি কিনে রেন্ট-এ-কার কোম্পানিকে ভাড়া দিলেও, আপনি প্রতি মাসে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাড়া পেয়ে থাকেন।

শুধু তাই নয়, সরকারি বা বেসরকারি, যেকোন প্রজেক্টে বিনিয়োগের পূর্বে সম্ভাব্য খরচ ও লাভের উপর ভিত্তি করে অর্থনৈতিক প্রাক্কলন দাঁড় করানো হয়। বিনিয়োগে সুদ থাকুক বা নাই থাকুক, প্রাক্কলনের সুবাদে জানা যায়, বিনিয়োগ করলে সম্ভাব্য লাভ কত হতে পারে, আর ক্ষতি হলেও বা তার পরিমাণ কত হতে পারে। প্রাক্কলনে

যদি দেখা যায়, সব খরচ করার পরেও লাভ থাকে, তখনই কেবল বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। অর্থাৎ, শুধু সুদের ক্ষেত্রেই নয়, অংশীদারিত্ব ব্যবসা পদ্ধতিতেও রিটার্ন সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করেই বিনিয়োগ করা হয়।

আপনি ভাবতে পারেন, তারপরেও তো কিছু পার্থক্য রয়ে যায়। সুদের রিটার্ন নিখুঁতভাবে নির্ণয় করা সম্ভব, কিন্তু ব্যবসার রিটার্নের বেলায় তা অসম্ভব। এধারণাটির সাথেও বাস্তবতার ফারাক থেকে যায়। সুদের রিটার্নও নিখুঁতভাবে নিরূপণ করা যায় না। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে দেউলিয়া হওয়ার হারে তারতম্য ঘটে এবং ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে, তা আগের থেকে বলা অসম্ভবই বটে। পাশাপাশি সুদে মনিটরিং, আইনি ব্যয়, কর্মচারী বেতন-বোনাস সহ নানা প্রকার আনুষঙ্গিক খরচ রয়েছে, যার কোনটাই আগে থেকে শতভাগ নির্ণয়যোগ্য না। তাই মোটা দাগে, সুদে ঋণ দিলে আগে থেকেই রিটার্ন জানা যায় কিন্তু ব্যবসায় বিনিয়োগ করলে জানা যায় না, এই কথাটা সত্য না।

সবশেষে যে অভিযোগটি আসে তা হচ্ছে সুদ অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি করে। লক্ষ্য করুন, যেকোন সফল ব্যবসা করেই কিন্তু একজন ব্যক্তির পক্ষে সম্পদশালী হওয়া সম্ভব। ব্যবসায়ীরা যেহেতু সমাজের অপরাপর সদস্যের সাথে লেনদেন থেকে অর্জিত অর্থেই ধনী হয়ে থাকেন, সেহেতু যেকোন সফল ব্যবসা করলেই ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে।

তাহলে যেই প্রশ্নটি আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা হলো, অর্থনৈতিকভাবে সুদের সাথে ব্যবসার তফাৎটা কোথায়? দুইজন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে সুদের লেনদেন করলে, তারা সমাজের কোন ক্ষতি করল কি? ধনী হবার কারণে একজন সাধারন ব্যবসায়ী যদি অপরাধী না হয়ে থাকেন, ঋণ-ব্যবসায়ী কেন সমাজ ও ধর্মের দৃষ্টিতে অপরাধী বলে বিবেচ্য হবেন? সেই

কোটি টাকার উত্তরের গভীরেই আমরা ডুব দেব। তবে তার আগে পাঠক পর্যায়ে অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন, যা এই আলোচনাকে বুঝতে সাহায্য করবে।

অর্থনৈতিক চিন্তার কাঠামো গঠন

অর্থনীতির জটিল বিষয়গুলো বোঝার একটি কার্যকরী পদ্ধতি হলো প্রথমে অতি সরল পরিসরে চিন্তা শুরু করা এবং পরবর্তীতে ধাপে ধাপে নতুন মাত্রা যুক্ত করা।
ছোট্ট একটা উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে। ধরুন, আজকে বাজারে গরুর মাংসের দর কেজিতে ৮০০ টাকা। এই ৮০০ টাকা দরে আপনার শহরে প্রতিদিন তিনশ কেজি গরুর মাংস বিক্রি হয়। হঠাৎ দরপতনে মাংসের দাম কেজি প্রতি মোটে ৫০০ টাকায় নেমে গেল। তখন কী হবে? ঠিক ধরেছেন, সবাই মাংস কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। অর্থাৎ, ৮০০ টাকা দরে বাজারে যতো মাংস বিক্রি হত, দাম কমে ৫০০ হলে তার তুলনায় বিক্রি অনেক বেড়ে যাবে। এবার যদি বলি, গরুর মাংসের দাম বেড়ে কেজিতে ১৫০০ টাকা হয়ে গেছে? তখন কী হবে? জি, মাংসের বাজারে ক্রেতা তো দূরে থাক, মাছিও উড়বে না। অর্থাৎ, ৮০০ টাকা দরে যতো কেজি মাংস বিক্রি হতো, দাম বেড়ে ১৫০০ টাকা হলে, মোট বিক্রি তার তুলনায় কমে যাবে।
এভাবে খুব সহজেই আমরা বলতে পারলাম যে,
"দাম কমলে, বিক্রি বেড়ে যাবে। আবার দাম বাড়লে, বিক্রি কমে যাবে।"
খেয়াল করুন, উপরে আমরা কেবল মাত্র ২টা নির্ধারক সামনে এনেছি, দাম ও বিক্রির পরিমাণ। এতেই দেখলাম দামের প্রভাবে বিক্রি বাড়ে ও কমে। আপনি-আমি

সবাই উপরের উদাহরণের সাথে পরিচিত। কিন্তু এখানে আমরা আরো একটা কাজ করেছি। বলতে পারেন সেটা কী? আমরা পারিপার্শ্বিক সব কিছু 'অপরিবর্তিত' থাকবে ধরে নিয়েছি। সেগুলো কী কী?

ধরুন, আপনার এলাকায় গরুর মাংসের দাম যেদিন কমে গেল, তার আগের দিন কমিশনার সাহেব সবার বাসায় ২০ কেজি করে মাংস উপহার পাঠালেন। তখন কি এতো পরিমাণ মাংস বিক্রি হতো?

আর যদি, সেদিন কুরবানীর ঈদের পরদিন হত? তাহলে কি আপনারা আগের মতো এতো বেশি মাংস কিনতেন? অবশ্যই না।

অর্থাৎ, আমরা দাম আর বিক্রির পরিমাণ নির্ধারণের বেলায় এরকম সম্ভাব্য ব্যাপারগুলো হিসেবের বাহিরে রেখে দিয়েছি। আমরা ধরে নিয়েছি এমন ব্যাপার ঘটবে না বা 'সংশ্লিষ্ট সবকিছু অপরিবির্তিত থাকবে'। অর্থনীতির ভাষায় একে বলে, 'সেটেরিস পারিবাস' (Ceteris Paribas)। তাই "দাম বাড়লে বিক্রি কমে এবং দাম কমলে বিক্রি বাড়ে", বলতে আমরা আসলে বুঝি, "অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবির্তত থাকলে, যদি দাম বাড়ে তাহলে বিক্রি কমে যাবে এবং যদি দাম কমে তাহলে বিক্রি বেড়ে যাবে।" অর্থনীতির এই চমকপ্রদ চিন্তার কাঠামোটা আমাদেরকে অভিভূত করে।

এখন এই কাঠামোটার একটি প্রায়োগিক প্রেক্ষিত দেই - ধরুন, উপরের উদাহরণ অনুসারে আমরা জানতে চাই, তেলের দাম বেড়ে গেলে গরুর মাংস খাওয়া বাড়বে নাকি কমবে? আচ্ছা, তেলের দামের সাথে গরুর মাংস খাওয়ার কী সম্পর্ক? ঠিক ধরেছেন, তেল দিয়েইতো মাংস রান্না করা হয়। সুতরাং, তেলের দাম বাড়লে গরুর মাংস রান্নার মোট খরচ বেড়ে যাবে। তাই আগের মতো মাংস খেতে হলে, আপনাকে বাড়তি পয়সা গুনতে হবে। আপনার 'মাসিক বাজেট আগের মতই থাকলে', আপনি গরুর মাংস কম রান্না করবেন অথবা, অন্যান্য খাবার কম খেয়ে মাংস রান্না

করবেন, অথবা বাসার আনুষাঙ্গিক ব্যয় কমাবেন... এরকম একশ-একটা পথ আছে, তাইতো?

এবার আমরা চিন্তার কাঠামোটা নিয়ে আসি। দেখুন কত সুন্দর কাজে লাগে।

প্রশ্নঃ 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে, যদি তেলের দাম বাড়ে তাহলে গরুর মাংসের বিক্রির কী হবে?'

উত্তরঃ যখনই বলছি, 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থাকলে', এর মানে হল, গরুর মাংসের সরবরাহ, আয়-রোজকার, মসলা খাওয়ার পরিমাণ, রান্নায় তেলের পরিমাণ, বাসার অন্যান্য খরচ এগুলো সব আগের জায়গায় থাকবে। কিছুই পরিবর্তিত হবে না। সব অপরিবর্তনশীল রেখে শুধু তেলের দাম বাড়িয়ে দেখবো এতে করে গরুর মাংসের বিক্রিতে কী ধরনের পরিবর্তন হয়।

দেখা যাবে, তেলের দাম বাড়লে, তেলের বিক্রিও কমে যাবে। আপনি গরুর মাংস রান্না করতে আগের মতই তেল ব্যবহার করলে এবং মাসিক বাজেট আগের মতই থাকলে কি আগের সমপরিমাণ মাংস রান্না করতে পারবেন? না, তা সম্ভব না। তার মানে, আপনি মাংস রান্না করা কমিয়ে দিবেন। সুতরাং, কাঠামোর মধ্যে রেখে আমরা উত্তর পেলাম যে, 'অপরাপর সব ব্যাপার অপরিবর্তিত থেকে তেলের দাম বেড়ে গেলে, গরুর মাংসের বিক্রি কমে যাবে'

আশা করি, আপনারা কাঠামোটি খুব সহজেই ধরতে পেরেছেন।

এভাবে, অর্থনীতির বিভিন্ন বিষয়কে উহ্য রেখে একটি সরল কাঠামোর মধ্যে ফেলে ফলাফল বিশ্লেষণ করা হয় (সেটিরাস পেরিবাস)। সব চিন্তাই শুরু হয় সরল পরিসরে, একটা-দুইটা মাত্রা দিয়ে। আলোচনা যতো সামনের দিকে আগায়, নতুন নতুন মাত্রা যোগ করে পরিসর বাড়াই এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করি। আমাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে সুদের প্রভাব কী? ব্যবসার সাথে এর পার্থক্য কী? তা বুঝতে প্রথমেই আমরা তাই রুপসাগর নামে একটা অর্থনৈতিক কাঠামোর

অবয়ব তৈরি করব।

রূপসাগর

দ্বীপরাষ্ট্র রূপসাগর আয়তনে বিশাল এবং প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর। তবে সব দিক থেকে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার জনসংখ্যা অত্যন্ত সীমিত। আপাতত দেশটিতে মোট দশটি পরিবার বসবাস করে। এদের কেউ মাছ ধরে, কেউ পশুপালন করে, কেউ তাঁত বুনে, কেউ কাঠের কাজ করে, কেউবা ব্যবসা করে এবং সারাদিন কাজ করে তারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাজার থেকে কেনাকাটা করে ঘরে ফিরে। সবকিছু ঠিকঠাক চললেও এই দেশের একটি সমস্যা হচ্ছে এখানে লেনদেন করার কোন সাধারণ বস্তু অর্থাৎ, 'টাকা' নেই। কেউ মাছের বিনিময়ে চাল, কেউ ধানের বিনিময়ে ডাল, কেউ শ্রমের বিনিময়ে খাদ্য এভাবে লেনদেন করে কাজ চালিয়ে নেয়। তবে বিনিময়ের জন্য উপযুক্ত পক্ষ খুঁজে না পেলে, বিপত্তি লেগে যায়। কোন একদিন হয়তো জেলের জালে বেশি মাছ ধরা পড়ে। সেদিনও তার ঘরে চাল লাগে। কিন্তু বাজারে গিয়ে জেলে মশাই যদি আবিষ্কার করেন, চাল বিক্রেতার সেদিন আর মাছের প্রয়োজন নেই, বরং সে হন্যে হয়ে কাপড় খুঁজছে। তখন কী উপায়?

সেক্ষেত্রে উপায় হচ্ছে মাছের প্রয়োজন রয়েছে এমন একজন তাঁতিকে প্রথমত খুঁজে বের করা। তারপর সেই তাঁতির থেকে মাছের বিনিময়ে কাপড় কিনে নেওয়া এবং সবশেষে সেই কাপড়ের বিনিময়ে কৃষকের থেকে চাল কিনে নেওয়া।

প্রক্রিয়াটি একটু জটিল হলেও সমাধানযোগ্য। কিন্তু এমন যদি হয় যে, কোন তাঁতিই মাছ কিনতে আগ্রহী না? সেক্ষেত্রে সত্যিই খুব বিপত্তি বাঁধবে, কারণ মাছ দীর্ঘসময় সংরক্ষণ করে রাখা যায় না।

বিনিময় প্রথায় লেনদেনের অনিশ্চয়তার সমাধানে দ্বীপের সবাই মিলে পরামর্শে

বসল, “কী করা যায়?” একজন বুদ্ধি দিলো, রূপসাগরের অধিবাসীরা এক রকম সোনালী ধাতু দিয়ে গহনা বানায়, যা ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সবাই খুব পছন্দ করে। কেউ এই সোনালী ধাতুর একটি গুটির বিনিময়ে এক মণ চাল কিনতে চাইলে, সব চাল বিক্রেতাই রাজি হয়ে যাবে। একইভাবে এমন একটি গুটির বিনিময়ে মাছ কিনতে গেলে, জেলেরাও মাছ বিক্রিতে সায় দেবে। এক কথায়, এই সোনালী ধাতুটা সর্বজন গ্রাহ্য এবং সাধারণ বস্তু। তাই লেনদেনের মাধ্যম হিসেবে এটাকে চালু করলেই, বাজার করতে আর কারো ঝক্কি পোহাতে হবে না। তাই সবার সম্মতিক্রমে রূপসাগরে সোনালী জিনিসটাকে (স্বর্ণ মুদ্রাকে) বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে চালু করা হলো। এককথায়, রূপসাগরের অর্থনীতি পণ্য বিনিময় প্রথার (barter system) যুগ পেরিয়ে মুদ্রা ব্যবস্থার যুগে প্রবেশ করলো। আর্থিক লেনদেনের সমস্যা সমাধানের এরকম প্রচেষ্টা থেকেই কালের আবর্তে মানুষ মুদ্রায় লেনদেন আরম্ভ করে।

এদিকে মুদ্রা প্রথা চালু করতে গিয়ে নতুন সমস্যা বাঁধলো। সবার কাছে তো স্বর্ণ নেই! একজন বুদ্ধি দিলো, "এখনও তো ‘কেনা-বেচা’ শুরু হয়নি, সব স্বর্ণ জড়ো করে সবার মাঝে সমানভাবে ভাগ করে দেই?”
সবাই ভেবেচিন্তে দেখলো, তাদের বাগ-বাগিচা, ঘর-বাড়ি, কল-কারখানা, সন্তান-সন্ততি, ক্ষমতা-প্রতিপত্তি সব আগের মতই থাকবে। কেবল সামান্য কিছু শখের বস্তু নিজেদের মাঝে ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এই কষ্টকর সিদ্ধান্তের বিনিময়ে এরপর থেকে সবার জন্য কেনাকাটা আরামদায়ক হলে, মেনে নিতে ক্ষতি কী? একবারের জন্যই তো। এমন সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই বার বার নিতে হচ্ছে না। তাই সাময়িক ক্লেশ সত্ত্বেও সবাই সিদ্ধান্তটি মেনে নিল এবং সেই পরিকল্পনা মোতাবেক সবার স্বর্ণ জড়ো করে মোট ১,০০০টি সোনার মুদ্রা তৈরি করা হল এবং মোট দশটি

পরিবারের মাঝে সেগুলো ১০০টি করে বিতরণ করে দেওয়া হল।

সুদ ও ব্যবসার পার্থক্য

মুদ্রা ব্যবস্থায় প্রবেশ করার পর রুপসাগরে লেনদেন প্রক্রিয়া অতি সাবলীল হয়ে গেল। প্রতিটা পরিবার এখন প্রয়োজনমত কেনা-বেচা করে নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরছে। সবে মাত্র পণ্য লেনদেন প্রথা থেকে উঠে আসা পরিবারগুলো যেই পরিমাণ জিনিস কিনছে, গড়পড়তা তার সমপরিমাণ জিনিসই বিক্রি করছে। ফলে, প্রত্যেকের কাছে কেনা-বেচা শেষে গড়পড়তা ১০০টি মুদ্রাই অবশিষ্ট থাকছে। তবে মানুষের জীবনে উত্থান-পতন থাকে, সব দিন একরকম যায় না। সে নিয়মের চক্রে রুপসাগরের এক তরুণ ব্যবসায়ী ‘জীবন’-এর জীবনে আপদ দেখা দিল। সেবারের মতো বিপাক কাটিয়ে উঠতে, তার চারটি স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন পড়লো। জীবন তার তরীর কাছে গিয়ে বলল, “এক মাসের জন্য ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ধার দেওয়া যাবে?”
জীবনের সমস্যা সমাধানে তরী সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।
এক্ষেত্রে মোট তিন প্রকার লেনদেন ঘটতে পারে।

কেস ০১ – সুদ মুক্ত ঋণ

তরী জীবনকে বিনা সুদে ঋণ দিতে পারে। অর্থাৎ, ঋণ দেবার পরে তরী বলবে, “যেই ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিয়ে, শুধু সেই ৪টি স্বর্ণমুদ্রা ফেরত দিলেই চলবে।”
এভাবে ঋণ নিলে এবং মাস শেষে ঋণ ফেরত দিলে, জীবন ও তরীর মাঝে মোট মুদ্রায় কোন পরিবর্তন আসবে কি?
না, আসবে না। দুজনের কাছেই মাস-শেষে সমান সংখ্যক স্বর্ণমুদ্রা অবশিষ্ট থাকবে।

একই শর্তে প্রতি মাসে একবার করে ১ বছরে মোট ১২ বার জীবন, তরীর কাছ থেকে ঋণ নিয়ে সেই ঋণ পরিশোধ করে দিলেও, বছর শেষে তাদের মালিকানাধীন মোট মুদ্রার সংখ্যার কোন পরিবর্তন আসবে না, সমপরিমাণই থাকবে।

আচ্ছা, ব্যবসায়ী জীবন ও ঋণদাতা তরী একত্রে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা করলে কী হতো?

কেস ০২ – অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা

এবারে ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরী জীবনকে বলল, “ঋণ তো ব্যবসার জন্যই প্রয়োজন। চলো, আমরা একসাথে ব্যবসা করি। তুমিও লাভ নাও, আমিও লাভ নেই। আবার লোকসান হলে দুইজনেরই হোক।”
তরীর প্রস্তাবটিতে জীবন রাজি হয়ে গেল।
রফা হল, জীবন ও তরী যথাক্রমে ৪টি করে স্বর্ণমুদ্রা বিনিয়োগ করবে। এই ৮টি স্বর্ণমুদ্রা তারা একটি প্রকল্পে খাটাবে এবং বছর শেষে প্রকল্পটি গুটিয়ে ফেলা হবে। লাভের অর্ধেক নিবে তরী, অর্ধেক নিবে জীবন। লোকসান হলে তার ভারও দুজনে সমানে সমানে বহন করবে।
ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি উভয়টা হওয়াই স্বাভাবিক। ধরা যাক, সবকিছু ঠিক থাকলে ৫০% সময় লাভ হবে এবং ৫০% সময় ক্ষতি হবে; তাহলে, ১২ মাসের মধ্যে লাভ হবে ৬ মাস এবং ক্ষতি হবে ৬ মাস।

ব্যবসায় লাভের মাসে জীবনের হাতে আসে ২টি স্বর্ণমুদ্রা, আর ক্ষতির মাসে তার হাত ছাড়া হয়ে যায় ২টি স্বর্ণমুদ্রা।

৫০% সময় ক্ষতি হওয়ায় ৬ মাসে মোট ক্ষতি হবে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা
৫০% সময় লাভ হওয়ায় ৬ মাসে মোট লাভ হবে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা

বছর শেষে প্রকল্প গুটিয়ে নিলে তরী ফেরত পাবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা এবং জীবন পাবে ৪টি স্বর্ণমুদ্রা। বছর শেষে দুইজনের কাছেই ১০০টি স্বর্ণমুদ্রা রয়ে যাবে।

কেস ০৩ – সুদে ঋণ

এই কেসে ধরে নেই, জীবন ঋণ নেয়ার কথা তুলতেই তরী শর্ত জুড়ে দিল, “৪টি স্বর্ণমুদ্রা ঋণ নিলে, ফেরত দিতে হবে ৬টি স্বর্ণমুদ্রা।” বিকল্প ব্যবস্থার অভাবে জীবন এই শর্তে রাজি হয়ে গেল এবং মাস শেষে সুদসমেত ঋণ পরিশোধ করলো। জীবন ও তরীর মোট মুদ্রার কি কোন পরিবর্তন এসেছে?
হ্যাঁ, এবার এসেছে। জীবনের কাছে মাস-শেষে ৯৮টি স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে এবং তরীর কাছে আছে ১০২টি স্বর্ণমুদ্রা।
এভাবে একই শর্তে ১২ বার (পুরো বছর) জীবন ঋণ নিলে ও সময়মত ঋণ পরিশোধ করলে, বছর শেষে তাদের মোট সম্পদের কি কোন পরিবর্তন আসবে?
হ্যাঁ, বছর শেষে জীবনের কাছে থাকবে ৭৬টি স্বর্ণমুদ্রা এবং তরীর কাছে থাকবে ১২৪টি স্বর্ণমুদ্রা।

এভাবে রূপসাগরে প্রথমবারের মতো ছোট্ট পরিসরে ও সরলরূপে নিশ্চিত অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূচনা হল।

খেয়াল করুন, উপরের কাঠামোতে ব্যবসায় লাভ-ক্ষতি, চুরি-ডাকাতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, দুর্ঘটনা, অসুখ-বিসুখ মৃত্যু-মহামারি সহ বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারতো। কিন্তু এখানে তার কিছুই ঘটেনি। কারণ, আমরা ধরেই নিয়েছি যে, এমন কিছু ঘটবে না। তারমানে,

“অন্য কোন উপাদানের প্রভাব ছাড়াই শুধুমাত্র সুদের কারণে একটি সমাজে সুনিশ্চিত বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে। ”

নিশ্চয়ই ব্যবসায় সফলতা ধরে রাখতে পারলে (৫০% এর অধিক সময় লাভ করলে), একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে অপরাপর সদস্যদের তুলনায় সম্পদশালী হওয়া সম্ভব। আবার ব্যবসা বিফল হলে তার পক্ষে সব খোয়ানোও সম্ভব। এভাবেও অর্থনৈতিক পার্থক্য হতে পারে। তাছাড়া অসুখ-বিসুখ, প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ নানা কারণে ধনী দরিদ্রের পার্থক্য তৈরি হতে পারে। তবে আমরা এদেরকে বৈষম্য বলতে পারি কি? লক্ষ্য করুন, এই নিয়ামকগুলো অনিশ্চিত এবং সমাজের যেকোন পক্ষের সাথে সংঘটিত হতে পারে। সেই তুলনায় সুদে অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টি হওয়া নিশ্চিত এবং তা নিতান্তই একপেশে।

এভাবে আমাদের বুনিয়াদি চিন্তাকাঠামো ‘রুপসাগর’ জনপদটি থেকে ‘সুদ’ এর সুনিশ্চিত বৈষম্যের আঙ্গিকটা সুস্পষ্ট হলো। আপনি সমগ্র পৃথিবীকে একটি দ্বীপ এবং এক একটি রাষ্ট্রকে এক একটি পরিবার হিসেবে কল্পনা করলে ঠিক এই ফলাফলেই পৌঁছাতেন। কেবল চিন্তার স্বচ্ছতা এবং ভাষার সরলতার স্বার্থেই রুপসাগরের উদাহরণ টেনে আনা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রূপসাগরের শিশুরা বড় হয়ে নতুন নতুন পরিবার গড়েছে এবং পরবর্তীতে, তাদের সন্তানরাও নয়া পরিবার গঠন করেছে। এভাবে দেশটির জনসংখ্যা আগের তুলনায় বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছে। একই সময়ে পারষ্পরিক লেনদেন, দুর্যোগ, কর্মস্পৃহা ও দুর্ভাগ্য ইত্যাদির প্রভাবে হাতে হাতে মুদ্রার সংখ্যায় বেশ অসমতাও দেখা দিয়েছে। কারো কম, কারো বেশি এভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তবে এখন পর্যন্ত এই সমাজটি সম্পূর্ণ সুদমুক্ত আছে (জীবন ও তরী সুদে লেনদেন করেনি এবং তাদের পরেও কেউ তা করে নি)। এমন একটি বৈচিত্র্যময় সমাজে সুদের ‘‘সুদীর্ঘ’’ প্রভাব কেমন হতে পারে?

মূল আলোচনা শুরু করার আগে, একটি বিষয় লক্ষ্য করেছেন কি? আমরা মোট তিনটি সরলীকৃত শর্ত তুলে নিয়েছি।

একঃ একদা সবার অর্থনৈতিক সক্ষমতা সমান থাকলেও, বর্তমানে তা অসমান। সমাজে কেউ ধনী এবং কেউ দরিদ্র।

দুইঃ ইতোপূর্বে দ্বীপের জনসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকলেও, বর্তমানে তা অনির্দিষ্ট এবং সময়ের সাথে দ্রুতবর্ধনশীল (মোট জনসংখ্যা যেকোন গ্রহণযোগ্য সংখ্যা হতে পারে)।

তিনঃ এককালে দ্বীপের অর্থনীতিতে কোন প্রবৃদ্ধি ছিল না। বর্তমানে সময়ের সাথে অর্থনীতির আকার বড় হচ্ছে।

সবমিলিয়ে, রূপসাগরের সমাজ এবং অর্থনীতি পূর্বের তুলনায় বৃহদায়তনের, গতিশীল ও বৈচিত্র্যময়। এবার এমন একটি কাঠামোতে মুদ্রা ব্যবস্থার উপর সুদের দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল আলোচনা করা যাক।